

Barcode - 4990010202516

Title - Shantiniketan vol. 4

Subject - LITERATURE

Author - Tagore, Rabindranath

Language - bengali

Pages - 92

Publication Year - 1908

Creator - Fast DLI Downloader

<https://github.com/cancerian0684/dli-downloader>

Barcode EAN.UCC-13



4 990010 202516

শান্তিনিকেতন

(চতুর্থ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য ১০ পানা

প্রকাশক—

শ্রীচাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়,
ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্
২২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

কাস্টক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিশরণ মাসাধারা মুদ্রিত।

সূচী

পাওয়া	১
সমগ্র	৯
কর্ম	১৬
শক্তি	২৪
প্রাণ	২৯
অগতে যুক্তি	৩৫
সমাজে যুক্তি	৪৫
মত	৫০
নির্বিষেণ	৫৮
ছই	৬৫
বিষয়্যাপী:	৭৪
মৃত্যুর প্রকাশ	৮১

শান্তিনিকেতন

পাওয়া

শক্তির ক্ষেত্রে যারা কাজ করে তারা অনন্ত উন্নতির কথা বলে। অর্থাৎ অনন্ত গতির উপরেই তারা জোর দেয়, অনন্ত স্থিতির উপর নয়। তারা অনন্ত চেষ্টার কথাই বলে, অনন্তলাভের কথা বলে না।

এইজন্ত ধর্মনীতিই তাদের শেষ সম্বল। নীতি কিনা নিয়ে যাবার জিনিষ—তা পথের পাথেয়। যারা পথকেই মানে তারা নীতিকেই চরমরূপে মানে—তারা গৃহের সম্বলের কথা চিন্তা করে না। কারণ যে গৃহে কোনো-কালেই মানুষ পৌঁছবে না, সে গৃহকে মানলেও

শান্তিনিকেতন

হয়, না যান্লেও হয়। যে উন্নতি অনন্ত
উন্নতি তাকে উন্নতি না বলে ক্ষতি হয় না।

কিন্তু শক্তিভক্তেরা বলে চলাটাই
আনন্দ—কারণ তাতে শক্তির চালনা হয় ;
লাভে শক্তির কর্মশেষ হয়ে গিয়ে নিশ্চেষ্ট
তামসিকতায় নিয়ে গিয়ে ফেলে ; বস্তুতঃ
ঐশ্বর্য্য পদার্থের গৌরবই এই যে সে আমাদের
কোনো লাভের মধ্যে এনে ধরে রাখেনা,
সে আমাদের অগ্রসর করতে থাকে।

যতক্ষণ আমাদের শক্তি থাকে ততক্ষণ
ঐশ্বর্য্য আমাদের থামতে দেয় না ;—কিন্তু
ছুর্গতির পূর্বে দেখতে পাই মানুষ বলতে থাকে,
এইটেই আমি চেয়েছিলুম এবং এইটেই আমি
পেয়েছি। তখন পথিকধর্ম্ম সে বিসর্জন
দিয়ে সঞ্চয়ীর ধর্ম্ম গ্রহণ করতে থাকে—তখন
সে আর সম্মুখের দিকে তাকায় না, যা পেয়েছে
সেইটেকে কি করলে আটেঘাটে বাঁধা যায় রক্ষা
করা যায় সেই কথাই সে ভাবতে থাকে।

কিন্তু সংসার জিনিষটা যে কেবলি সরে,
কেবলি সরায়। এখানে হয় সরতে থাক,
নয় মরতে থাক। এখানে যে বলেচে আমার
যথেষ্ট হয়েছে, এইবার যথেষ্টের মধ্যে বাসা
বাঁধব সেই ডুবেছে।

ইতিহাসে বড় বড় জাতির মধ্যেও দেখতে
পাই যে, তারা এক জায়গায় এসে বলে এইবার
আমার পূর্ণতা হয়েছে—এইবার আমি সঞ্চয়
করব, রক্ষা করব, বাঁধাবাঁধি হিসাব বরাদ্দ
করব, এইবার আমি ভোগ করব ;—তখন
আর সে নূতন তত্বকে বিশ্বাস করে না—তখন
তার এতদিনের পথের সম্বল ধর্মনীতিকে
দুর্বলতা বলে উপহাস ও অপমান করতে
থাকে, মনে করে এখন আর এর প্রয়োজন
নেই—এখন আমি বলী, আমি জয়ী, আমি
প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু প্রবাহের উপরে যে লোক প্রতিষ্ঠার
ভিত্তি স্থাপন করতে চায় তার যে দশা

শান্তিনিকেতন

হয় সে কারো অগোচর নেই। তাকে
ডুবতেই হয়। এমন কত জাতি ডুবে
গেছে।

কেবলি উন্নতি, কেবলি গতি, পরিণাম
কোথাও নেই এমন একটা অদ্ভুত কথার
উৎপত্তি হয়েছে এই কারণেই। কারণ, মানুষ
দেখেছে সংসারে থামতে গেলেই মরতে হয়।
এই নিয়মকে যারা উপলব্ধি করেছে তারা
স্থিতি ও লাভকে অস্বীকার করে।

স্থিতিহীন গতি, লাভহীন চেষ্টাই যদি
মানুষের ভাগ্য হয় তবে এমন ভয়ানক দুর্ভাগ্য
আর কি হতে পারে! একথা ঐশ্বর্য্য গর্বে
উন্নততার অন্ধ হয়ে বলা চলে কিন্তু একথা
আমাদের অন্তরাত্মা কখনই সম্পূর্ণ সম্মতির
সঙ্গে বলতে পারে না।

তার কারণ, একটা জায়গায় আমাদের
পাওয়ার পছন্দ আছে। সে হচ্ছে যেখানে
ঈশ্বর স্বয়ং নিজেকে ধরা দিয়েছেন। সেখানে

আমরা তাঁকে পাই কেন, না তিনি নিজেকে দিতে চান বলেই পাই।

কোথায় পাই ? বাহিরে নয়, প্রকৃতিতে নয়, বিজ্ঞানতত্ত্বে নয়, শক্তিতে নয়—পাই জীবাত্মায়। কারণ, সেখানে তাঁর আনন্দ, তাঁর প্রেম। সেখানে তিনি নিজেকে দিতেই চান। যদি কোনো বাধা থাকে তবে আমাদেরই দিকে—তাঁর দিকে নয়।

এই প্রেমে পাওয়ার মধ্যে তামসিকতা নেই জড়ত্ব নেই। এই যে লাভ এ চরম লাভ বটে কিন্তু পঞ্চত্বলাভের মত এতে আমরা বিনষ্ট হইনে। তার কারণ আমরা পূর্বেই একদিন আলোচনা করেছি। শক্তির পাওয়া ব্যাপারে পেলেই শক্তি নিশ্চেষ্ট হয় কিন্তু প্রেমের পাওয়ায় পেলে প্রেম নিশ্চেষ্ট হয় না—বরঞ্চ তার চেষ্টা আরো গভীররূপে জাগ্রত হয়।

এইজন্যে এই যে প্রেমের ক্ষেত্রে ঈশ্বর আমাদের কাছে ধরা দেন—এই ধরা দেওয়ার

শান্তিনিকেতন

দ্রুণ তিনি আমাদের কাছে ছোট হয়ে যান না—তাঁর পাওয়ার আনন্দ নিরন্তর প্রবাহিত হয়—সেই পাওয়া নিত্য নূতন থাকে ।

মানুষের মধ্যেও যখন আমাদের সত্য প্রেম জাগত হয়ে ওঠে তখন সেই প্রেমের বিষয়কে লাভ করেও লাভের অন্ত থাকে না— এমন স্থলে ব্রহ্মের কথা কি বলব ? সেই কথায় উপনিষৎ বলেছেন —“আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন”—ব্রহ্মের আনন্দ ব্রহ্মের প্রেম যিনি জেনেছেন তিনি কোনো-কালেই আর ভয় পান না ।

অতএব মানুষের একটা এমন পাওয়া আছে যার সম্বন্ধে চিরকালের কথাটা প্রয়োগ করা যেতে পারে ।

ভারতবর্ষ এই পাওয়ার দিকেই খুব করে মন দিয়েছিলেন । সেইজন্মেই ভারতবর্ষের হৃদয় মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়ে বলেছেন “ষেনাহং নাযুতাস্তাম্ কিমহং তেন কুৰ্যাম্ ?”



সেইজন্মে মৃত্যুর দিক থেকে অমৃতের দিকে ভারতবর্ষ আপনার আকাঙ্ক্ষা প্রেরণ করে-
ছিলেন।

সেদিকে যারা মন দিয়েছে বাইরে থেকে দেখে তাদের বড় বলে ত বোধ হয় না। তাদের উপকরণ কোথায়? ঐশ্বর্য কোথায়?

শক্তির ক্ষেত্রে যারা সফল হয় তারা আপনাকে বড় করে সফল হয়—আর অধ্যাত্মক্ষেত্রে যারা সফল হয় তারা আপনাকে ত্যাগ করে সফল হয়। এইজন্ম দীন যে সে সেখানে ধন্য। যে অহঙ্কার করবার কিছুই রাধেনি সেই ধন্য—
কেননা, ঈশ্বর স্বয়ং যেখানে নত হয়ে আমার কাছে এসেছেন, সেখানে যে নত হতে পারবে সেই তাঁকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারবে। এইজন্মেই প্রতিদিন প্রার্থনা করি, “নমস্তেহস্ত”
—তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি, যেন নত হতে পারি, নিজের অভিমান কোথাও কিছু যেন না থাকে।

শান্তিনিকেতন

“জগতে তুমি রাজা অসীম প্রতাপ,
হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়হরণ রূপ ।
নীলাধর জ্যোতিখচিত চরণপ্রাস্তে প্রসারিত,
ফিরে সত্তরে নিয়মপথে অনন্তলোক ।
নিভৃত হৃদয়মাঝে কিবা প্রসন্ন মুখচ্ছবি,
প্রেমপরিপূর্ণ মধুরভাতি ।
ভকতহৃদয়ে তব করুণারস সতত বহে,
দীনমনে সতত কর অভয়দান ॥

২৫শে পৌষ



সমগ্র

এই প্রাতঃকালে যিনি আমাদের জাগালেন
তিনি আমাদের সবদিক দিয়েই জাগালেন।
এই যে আলোটি ফুটে পড়েছে এ আমাদের
কর্ণের ক্ষেত্রেও আলো দিচ্ছে, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও
আলো দিচ্ছে—সৌন্দর্য্যক্ষেত্রেও আলোকিত
করছে। এই ভিন্ন ভিন্ন পথের জন্তে তিনি
ভিন্ন ভিন্ন দূত পাঠান নি—তার একই দূত
সকল পথেরই দূত হয়ে হাশুমুখে আমাদের
সম্মুখে অবতীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু আমাদের বোঝবার প্রক্রিয়াই এই
যে সত্যকে আমরা একমুহূর্তে সমগ্র করে
দেখতে পাইনে। প্রথমে ধণ্ড ধণ্ড করে, তার
পরে জোড়া দিয়ে দেখি। এই উপায়ে ধণ্ডের
হিসাবে সত্য করে দেখতে গিয়ে সমগ্রের
হিসাবে ভুল করে দেখি। ছবিতে একটি



শান্তিনিকেতন

পরিপ্রেক্ষণতত্ত্ব আছে—তদনুসারে দূরকে ছোট করে এবং নিকটকে বড় করে আঁকতে হয়। তা যদি না করি তবে ছবিটি আমাদের কাছে সত্য বলে মনে হয় না। কিন্তু সমগ্র সত্যের কাছে দূর নিকট নেই, সবই সমান নিকট। এইজন্যে নিকটকে বড় করে ও দূরকে ছোট করে দেখা সারা হলে তার পরে সমগ্র সত্যের মধ্যে তাকে সংশোধন করে নিতে হয়।

মানুষ একসঙ্গে সমস্তকে দেখবার চেষ্টা করলে সমস্তকেই ঝাপসা দেখে বলেই প্রথমে খণ্ড খণ্ড করে তার পরে সমস্তের মধ্যে সেটা মিলিয়ে নেয়। এই জন্তু কেবল খণ্ডকে দেখে সমগ্রকে যদি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তবে তার ভয়ঙ্কর জবাবদিহি আছে; আবার কেবল সমগ্রকে লক্ষ্য করে খণ্ডকে যদি বিলুপ্ত করে দেখে তবে সেই শূন্যতা তার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হয়।

এ কয়দিন আমরা প্রাকৃতিক ক্ষেত্র এবং

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র করে দেখ্ছিলুম।
এ রকম না করলে তাদের সুস্পষ্ট চিত্র আমা-
দের কাছে প্রত্যক্ষ হতে পারে না। কিন্তু
প্রত্যেকটিকে যখন সুস্পষ্টভাবে জানা সারা
হয়ে যায় তখন একটা মস্ত ভুল সংশোধনের
সময় আসে। তখন পুনর্বার এই দুটিকে
একের মধ্যে যদি না দেখি তাহলে বিপদ ঘটে।

এই প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক যেখানে
পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করেছে সেখান থেকে
আমাদের লক্ষ্য যেন একান্ত স্থলিত না হয়।
যেখানে সত্যের মধ্যে উভয়ের আত্মীয়তা আছে
সেখানে মিথ্যার দ্বারা আত্মবিচ্ছেদ না ঘটাই।
কেবলমাত্র ভাষা, কেবল তর্ক, কেবল মোহের
দ্বারা প্রাচীর গাঁথে তুলে সেইটেকেই সত্য
পদার্থ বলে যেন ভুল না করি।

পূর্ব এবং পশ্চিম দিক যেমন একটি অখণ্ড
গোলকের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে—প্রাকৃতিক
এবং আধ্যাত্মিক তেমনি একটি অখণ্ডতার দ্বারা

শান্তিনিকেতন

বিধৃত । এর মধ্যে একটিকে পরিহার করতে গেলেই আমরা সমগ্রতার কাছে অপরাধী হব—এবং সে অপরাধের দণ্ড অবশ্যস্বাবী ।

ভারতবর্ষ যে পরিমাণে আধ্যাত্মিকতার দিকে অতিরিক্ত ঝোক দিয়ে প্রকৃতির দিকে ওজন হারিয়েছে, সেই পরিমাণে তাকে আজ পর্যন্ত জরিমানার টাকা গুণে দিয়ে আসতে হচ্ছে । এমন কি, তার ষথাসর্বস্ব বিকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে । ভারতবর্ষ যে আজ শ্রীভ্রষ্ট হয়েছে তার কারণ এই যে সে একচক্ষু হরিণের মত জান্ত না যে, যেদিকে তার দৃষ্টি থাকবেনা সেই দিক থেকেই ব্যাধের মৃত্যুবাণ এসে তাকে আঘাত করবে । প্রাকৃতিক দিকে সে নিশ্চিতভাবে কানা ছিল—প্রকৃতি তাকে মৃত্যুবাণ মেরেছে ।

একথা যদি সত্য হয় যে পাশ্চাত্য জাতি প্রাকৃতিক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ জয়লাভ করবার জন্য একেবারে উন্নত হয়ে উঠেছে তাহলে

একথা নিশ্চয়ই জানতে হবে একদিন তার পরাজয়ের ব্রহ্মাস্ত্র অত্ৰদিক্ থেকে এসে তার মর্মান্থানে বাজবে ।

মূলে যাদের ঐক্য আছে, সেই ঐক্যমূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে তারা যে কেবল পৃথক হয়, তা নয়, তারা পরম্পরের বিরোধী হয় । ঐক্যের সহজ টানে যারা আত্মীয়রূপে থাকে, বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়ে তারা প্রলয়সংঘাতে আকৃষ্ট হয় ।

অর্জুন এবং কর্ণ সহোদর ভাই । মাঝখানে কুস্তীর বন্ধন তারা যদি না হারিয়ে ফেলত তাহলে পরম্পরের যোগে তারা প্রবল বলী হত ;—সেই মূল বন্ধনটি বিস্মৃত হওয়াতেই তারা কেবলি বলেছে, হয় আমি মরব, নয় তুমি মরবে ।

তেমনি আমাদের সাধনাকে যদি অত্যন্ত ভাবে প্রকৃতি অথবা আত্মার দিকে স্থাপন করি তাহলে আমাদের ভিতরকার প্রকৃতি এবং

শান্তিনিকেতন

আত্মার মধ্যে লড়াই বেধে যায় । তখন প্রকৃতি বলে, আত্মা মরুক আমি থাকি, আত্মা বলে প্রকৃতিটা নিঃশেষে মরুক আমি একাধিপত্য করি । তখন প্রকৃতির দলের লোকেরা কস্মকেই প্রচণ্ড এবং উপকরণকেই প্রকাণ্ড করে তুলতে চেষ্টা করে ; এর মধ্যে আর দয়ামায়া নেই, বিরাম বিশ্রাম নেই । ওদিকে আত্মার দলের লোকেরা প্রকৃতির রসদ একেবারে বন্ধ করে বসে, কস্মের পাঠ একেবারে তুলে দেয়, নানা-প্রকার উৎকট কৌশলের দ্বারা প্রকৃতিকে একেবারে নিস্কূল করতে চেষ্টা করে—জানে না সেই একই মূলের উপরে তার আত্মার কল্যাণও অবস্থিত ।

এইরূপে যে দুইটি পরম্পরের পরমাঙ্গীয়, পরম সহায় ; মানুষ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে তাদের পরম শত্রু করে তোলে । এমন নিদারুণ শত্রুতা আর নেই—কারণ, এই দুই পক্ষই পরম ক্ষমতামালী ।

সমগ্র

অতএব, প্রকৃতি এবং আত্মা, মানুষের এই দুই দিককে আমরা যখন স্বতন্ত্র করে দেখেছি তখন যত শীঘ্র সম্ভব এদের দুটিকে পরিপূর্ণ অধঃতার মধ্যে সম্মিলিতরূপে দেখা আবশ্যিক। আমরা যেন এই দুটি অনস্তুবকুর বন্ধুত্বসূত্রে অন্তায় টান দিতে গিয়ে উভয়কে কুপিত করে না তুলি !

২৬শে পৌষ



কৰ্ম

আমাদের দেশের জ্ঞানী সম্প্রদায় কৰ্মকে বন্ধন বলে থাকেন। এই বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিষ্ক্রিয় হওয়াকেই তাঁরা মুক্তি বলেন। এইজন্য কৰ্মক্ষেত্র প্রকৃতিকে তাঁরা ধ্বংস করে নিশ্চিন্ত হতে চান।

এইজন্য ব্রহ্মকেও তাঁরা নিষ্ক্রিয় বলেন এবং যা কিছু জাগতিক ক্রিয়া, এ'কে মায়া বলে একেবারে অস্বীকার করেন।

কিন্তু উপনিষৎ বলেন—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রমত্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজ্ঞাসস্ব, তদ্ব্রহ্ম। যার থেকে সমস্তই জন্মাচ্ছে, যার দ্বারা জীবন ধারণ করছে, যাতে প্রয়াণ ও প্রবেশ করছে তাঁকে জানতে ইচ্ছা কর তিনিই ব্রহ্ম।

অতএব উপনিষদের ব্রহ্মবাদী বলেন, ব্রহ্মই সমস্ত ক্রিয়ার আধার ।

তা যদি হয় তবে কি তিনি এই সকল কর্মের দ্বারা বদ্ধ ?

এক দিকে কর্ম আপনিই হচ্ছে, আর এক দিকে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র হয়ে রয়েছেন, পরস্পরে কোনো যোগ নেই, এ কথাও যেমন আমরা বলতে পারিনে, তেমনি তাঁর কর্ম মাকড়ষার জালের মত শামুকের খোলার মত তাঁর নিজেকে বদ্ধ করতে একথাও বলা চলে না ।

এই জগতই পরক্ৰমে ব্রহ্মবাদী বলছেন, আনন্দাক্ষেপ ঋষিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি-সংবিশন্তি ।

ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ । সেই আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন, জীবিত, সচেষ্ট এবং রূপাস্তরিত হচ্ছে ।

কর্ম ছই রকমে হয়—এক অভাবের থেকে

শান্তিনিকেতন

হয়, আর প্রাচুর্য্য থেকে হয়। অর্থাৎ প্রয়োজন থেকে হয়, বা আনন্দ থেকে হয়।

প্রয়োজন থেকে, অভাব থেকে আমরা যে কর্ম করি সেই কর্মই আমাদের বন্ধন, আনন্দ থেকে যা করি সে ত বন্ধন নয়—বস্তুর সেই কর্মই মুক্তি।

এই জগৎ আনন্দের স্বভাবই হচ্ছে ক্রিয়া—আনন্দ স্বতই নিজেকে বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে মুক্তিদান করতে থাকে। সেই জগৎই অনন্ত আনন্দের অনন্ত প্রকাশ। ব্রহ্ম যে আনন্দ সে এই অনিশেষ প্রকাশধর্মের দ্বারাই অহরহ প্রমাণ হচ্ছে। তাঁর ক্রিয়ার মধ্যেই তিনি আনন্দ এইজগৎ তাঁর কর্মের মধ্যেই তিনি মুক্ত স্বরূপ।

আমরাও দেখেছি আমাদের আনন্দের কর্মের মধ্যেই আমরা মুক্ত। আমরা প্রিয়বন্ধুর যে কাজ করি সে কাজ আমাদের দাসত্বে বদ্ধ করে না। শুধু বদ্ধ করে না তা

নয় সেই কর্মই আমাদের মুক্ত করে। কারণ, আনন্দের নিষ্ক্রিয়তাই তার বন্ধন, কর্মই তার মুক্তি।

তবে কর্ম কখন বন্ধন? যখন তার মূল আনন্দ থেকে সে বিচ্যুত হয়। বন্ধুর বন্ধুত্বটুকু যদি আমাদের অগোচর থাকে যদি কেবল তার কাজমাত্রই আমাদের চোখে পড়ে তবে সেই বিনাবেতনের প্রাণপণ কাজকে তার প্রতি একটা ভয়ঙ্কর অত্যাচার বলে আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে।

কিন্তু বস্তুত তার প্রতি অত্যাচার কোন্টা হবে? যদি তার কাজ বন্ধ করে দিই। কারণ কর্মের মুক্তি আনন্দের মধ্যে এবং আনন্দের মুক্তি কর্মে। সমস্ত কর্মের লক্ষ্য আনন্দের দিকে এবং আনন্দের লক্ষ্য কর্মের দিকে।

এইজন্য উপনিষৎ আমাদের কর্ম নিষেধ করেন নি। ঈশোপনিষৎ বলেছেন, মানুষ

শান্তিনিকেতন

কর্ম প্রবৃত্ত হবে না এ কোনোমতে হতেই পারে না ।

এইজন্য তিনি পুনশ্চ বলেছেন যারা কেবল অবিদ্যায় অর্থাৎ সংসারে কর্মে রত তারা অন্ধকারে পড়ে, আর যারা বিদ্যায় অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মজ্ঞানে রত তারা ততোধিক অন্ধকারে পড়ে ।

এই সমস্তার মীমাংসাস্বরূপ বলেছেন কর্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন আছে । “অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ষ্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে” কর্মের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাধারা জীব অমৃত লাভ করে ।

ব্রহ্মহীন কর্ম অন্ধকার এবং কর্মহীন ব্রহ্ম ততোধিক শূন্যতা । কারণ তাকে নাস্তিকতা বলেও হয় । যে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হতে সমস্ত কিছুই হচ্ছে সেই ব্রহ্মকে এই সমস্ত-কিছু-বিবর্জিত করে দেখলে সমস্তকে ত্যাগ করা হয় সেই সঙ্গে তাঁকেও ত্যাগ করা হয় ।

যাই হোক আনন্দের ধর্ম যদি কর্ম হয়

তবে কর্মের দ্বারাই সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে। গীতায় এ'কেই বলে কর্মযোগ।

কর্মযোগের একটি লৌকিকরূপ পৃথিবীতে আমরা দেখেছি। সে হচ্ছে পতিব্রতা স্ত্রীর সংসারযাত্রা। সতী স্ত্রীর সমস্ত সংসার-কর্মের মূলে আছে স্বামীর প্রতি প্রেম; স্বামীর প্রতি আনন্দ। এইজন্য, সংসারকর্মকে তিনি স্বামীর কর্ম জেনেই আনন্দবোধ করেন—কোনো ক্রীতদাসীও তাঁর মত এমন করে কাজ করতে পারে না। এই কাজ যদি একান্ত তাঁর নিজের প্রয়োজনের কাজ হত তা হলে এর ভার বহন করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হত। কিন্তু এই সংসারকর্ম তাঁর পক্ষে কর্মযোগ। এই কর্মের দ্বারাই তিনি স্বামীর সঙ্গে বিচিত্রভাবে মিলিত হচ্চেন।

আমাদের কর্মক্ষেত্র এই কর্মযোগের যদি তপোবন হয় তবে কর্ম আমাদের পক্ষে বন্ধন

শান্তিনিকেতন

হয় না। তাহলে, সতী স্ত্রী যেমন কর্মের দ্বারাই কর্মকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমকে লাভ করেন আমরাও তেমনি কর্মের দ্বারাই কর্মের সংসারকে উত্তীর্ণ হয়ে—“মৃত্যুং তীৰ্ণা”— অমৃতকে লাভ করি।

এইজগত্ই গৃহস্থের প্রতি উপদেশ আছে তিনি যে যে কাজ করবেন তা নিজেকে যেন নিবেদন না করেন—তা করলেই কর্ম তাঁকে নাগপাশে বাঁধবে এবং দীর্ঘাঘেষ লোভক্ষোভের বিষনিঃশ্বাসে তিনি জর্জরিত হতে থাকবেন— তিনি “যদযৎকর্মপ্রকুর্বাতি তদ্বুদ্ধি সর্পয়েৎ”—যে যে কর্ম করবেন সমস্ত ব্রহ্মকে সমর্পণ করবেন। তাহলে, সতী গৃহিণী যেমন সংসারের সমস্ত ভোগের অংশ পরিত্যাগ করেন অথচ সংসারের সমস্ত ভার অশ্রান্ত যত্নে বহন করেন, কারণ, কর্মকে তিনি স্বার্থসাধনরূপে জানেন না আনন্দসাধনরূপেই জানেন—আমরাও তেমনি কর্মের আসক্তি দূর করে কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা

কৰ্ম

বিসৰ্জন কৰে কৰ্মকে বিশুদ্ধ আনন্দময় কৰে
তুলতে পাব—এবং যে আনন্দ আকাশে না
থাকলে “কোহেবাগ্ৰাৎ কঃ প্ৰাণ্যাৎ” কেই বা
কিছুমাত্র চেষ্টা কৰত, কেই বা প্ৰাণ ধারণ
কৰত—জগতের সেই সকল চেষ্টার আকর
পৰমানন্দেৰ সঙ্গে আমাদেৰ সকল চেষ্টাকে
যুক্ত কৰে জেনে আমরা কোনোকালেও এবং
কাহা হতেও ভয়প্ৰাপ্ত হব না ।

২৭শে পৌষ

—

শক্তি

জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি এই তিন ধারা যেখানে একত্র সঙ্গত সেইখানেই আনন্দতীর্থ। আমাদের মধ্যে জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের যে পরিমাণে পূর্ণ মিলন সেই পরিমাণেই আমাদের পূর্ণ আনন্দ। বিচ্ছেদ ঘটলেই পীড়া উৎপন্ন হয়।

এইজগতে কোনো একটা সংক্ষেপ উপায়ের প্রলোভনে যেখানে আমরা ফাঁকি দেব সেখানে আমরা নিজেকেই ফাঁকি দেব। যদি মনে করি দ্বারীকে ডিঙিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করব তাহলে দেউড়িতে এমনি আমাদের লাঞ্ছনা হবে যে, রাজদর্শনই দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। যদি মনে করি নিয়মকে বর্জন করে নিয়মের উর্দ্ধে উঠব তাহলে কুপিত নিয়মের হাতে আমাদের দুঃখের একশেষ হবে।

বিধানকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে' তবেই

বিধানের মধ্যে আমাদের কর্তৃত্ব আছে। গৃহের যে কর্তা হতে চায় গৃহের সমস্ত নিয়ম সংঘম তাকেই সকলের চেয়ে বেশি মানতে হয়—সেই স্বীকারের দ্বারাই সেই কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করে।

এই কারণেই বলছিলাম, সংসারের মধ্যে থেকেই আমরা সংসারের উর্দ্ধে উঠতে পারি—কর্মের মধ্যে থেকেই আমরা কর্মের চেয়ে বড় হতে পারি। পরিত্যাগ করে, পলায়ন করে কোনোমতেই তা সম্ভব হয় না।

কারণ, আমাদের যে মুক্তি, সে স্বভাবের দ্বারা হলেই সত্য হয়, অভাবের দ্বারা হলে হয় না। পূর্ণতার দ্বারা হলেই তবে সে সার্থক হয়, শূন্যতার দ্বারা সে শূন্য ফলই লাভ করে।

অতএব যিনি মুক্তস্বরূপ সেই ব্রহ্মের দিকে লক্ষ্য কর। তিনি না-রূপেই মুক্ত নন তিনি হাঁ-রূপেই মুক্ত। তিনি ঔ; অর্থাৎ তিনি হাঁ।

শান্তিনিকেতন

এইজন্য ব্রহ্মর্ষি তাঁকে নিষ্ক্রিয় বলেন নি, অত্যন্ত স্পষ্ট করেই তাঁকে সক্রিয় বলেছেন। তাঁরা বলেছেন “পরাসু শক্তিবিবিধৈব ক্রমতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।” শুনেছি এর পরমাশক্তি এবং এঁর বিবিধাশক্তি—এবং এঁর জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া স্বাভাবিকী।

ব্রহ্মের পক্ষে ক্রিয়া হচ্ছে স্বাভাবিক—অর্থাৎ তাঁর স্বভাবেই সেই ক্রিয়ার মূল, বাইরে নয়। তিনি করছেন, তাঁকে কেউ করাচ্ছে না।

এইরূপে তিনি তাঁর কর্মের মধ্যেই মুক্ত—কেননা এই কর্ম তাঁর স্বাভাবিক। আমাদের মধ্যেও কর্মের স্বাভাবিকতা আছে। আমাদের শক্তি, কর্মের মধ্যে উন্মুক্ত হতে চায়। কেবল বাইরের প্রয়োজনবশত নয়, অন্তরের ক্ষুধিবশত।

সেই কারণে কর্মেই আমাদের স্বাভাবিক মুক্তি। কর্মেই আমরা বাহির হই প্রকাশ পাই। কিন্তু যাতেই মুক্তি তাতেই বন্ধন

ঘটতে পারে। নোকোর যে গুণ দিয়ে তাকে টেনে নেওয়া যায় সেই গুণ দিয়েই তাকে বাঁধা যেতে পারে। গুণ যখন তাকে বাইরের দিকে টানে তখন সে চলে যখন নিজের দিকেই বেঁধে রাখে তখন সে পড়ে থাকে।

আমাদেরও কর্ম যখন স্বার্থের সঙ্কীর্ণতার মধ্যেই কেবল পাক দিতে থাকে তখন কর্ম ভয়ঙ্কর বন্ধন। তখন আমাদের শক্তি সেই পরাশক্তির বিরুদ্ধে চলে, বিবিধা শক্তির বিরুদ্ধে চলে। তখন সে ভূমার দিকে চলে না, বহুর দিকে চলে না, নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই আবদ্ধ হয়। তখন এই শক্তিতে আমাদের মুক্তি দেয় না, আনন্দ দেয় না, তার বিপরীতেই আমাদের নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি কর্মহীন অলস সেই রুদ্ধ। যে ব্যক্তি ক্ষুদ্রকর্মা স্বার্থপর, জগৎ-সংসারে তার সশ্রম কারাবাস। সে স্বার্থের কাঁরাগারে অহোরাত্র একটা ক্ষুদ্র পরিধির কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে ঘানি টান্চে এবং

শান্তিনিকেতন

এই পরিশ্রমের ফলকে সে যে চিরদিনের মত
আয়ত্ত করে রাখবে এমন সাধ্য তার নেই ;
এ তাকে পরিত্যাগ করতেই হয়, তার কেবল
পরিশ্রমই সার ।

অতএব কর্মকে স্বার্থের দিক থেকে পর-
মার্থের দিকে নিয়ে যাওয়াই মুক্তি—কর্মত্যাগ
করা মুক্তি নয় । আমরা যে-কোনো কর্মই
করি—তা ছোটই হোক আর বড়ই হোক
সেই পরামাশ্রয় স্বাভাবিকী বিশ্বক্রিয়ার সঙ্গে
তাকে যোগযুক্ত করে দেখলে সেই কর্ম
আমাদের আর বন্ধ করতে পারবে না—সেই
কর্ম সত্যকর্ম, মঙ্গল কর্ম এবং আনন্দের কর্ম
হয়ে উঠবে ।

২৮শে পৌষ

প্রাণ

আত্মকৌড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ
ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ—ব্রহ্মবিদ্দের মধ্যে যারা
শ্রেষ্ঠ পরমাত্মায় তাঁদের কৌড়া, পরমাত্মায়
তাঁদের আনন্দ এবং তাঁরা ক্রিয়াবান্ ।

শুধু তাঁদের আনন্দ নয়, তাঁদের কর্মও
আছে ।

এই শ্লোকটির প্রথমার্ধটুকু তুলেই
কথাটার অর্থ স্পষ্টতর হবে ।

“প্রাগোহেয যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্
বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী”

এই যিনি প্রাণরূপে সকলের মধ্যে
প্রকাশ পাচ্ছেন—এঁকে যিনি জানেন তিনি
এঁকে অতিক্রম করে কোনো কথা বলেন না ।

প্রাণের মধ্যে আনন্দ এবং কর্ম এই দুটো
জিনিস একত্র মিলিত হয়ে রয়েছে । প্রাণের

শান্তিনিকেতন

সচেষ্টতাতেই প্রাণের আনন্দ—প্রাণের আনন্দেই তার সচেষ্টতা ।

অতএব, ব্রহ্মই যদি সমস্ত সৃষ্টির প্রাণস্বরূপ হন, তিনিই যদি সৃষ্টির মধ্যে গতির দ্বারা আনন্দ ও আনন্দের দ্বারা গতি সঞ্চারণ করছেন, তবে যিনি ব্রহ্মবাদী তিনি শুধু ব্রহ্মকে নিয়ে আনন্দ করবেন না ত, তিনি ব্রহ্মকে নিয়ে কর্ম্যও করবেন ।

তিনি যে ব্রহ্মবাদী । তিনি ত শুধু ব্রহ্মকে জানেন তা ত নয়, তিনি যে ব্রহ্মকে বলেন । না বললে তাঁর আনন্দ বাঁধ মান্বে কেন ? তিনি বিশ্বের প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাণের মধ্যে নিয়ে “ভবতে নাতিবাদী ।” অর্থাৎ ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে কোনো কথা বলতে চান না—তিনি ব্রহ্মকেই বলতে চান ।

মানুষ ব্রহ্মকে কেমন করে বলে ?
সেতারের তার যেমন করে গানকে বলে ।
সে নিজের সমস্ত গতির দ্বারা,

স্পন্দনের দ্বারা, ক্রিয়ার দ্বারাই বলে—সর্বতো-
ভাবে গানকে প্রকাশের দ্বারাই সে নিজের
সার্থকতা সাধন করে।

ব্রহ্ম, নিজেকে কেমন করে বলছেন ?
নিজের ক্রিয়ার দ্বারা অনন্ত আকাশকে আলোকে
ও আকারে পরিপূর্ণ করে স্পন্দিত করে
বাহুত করে তিনি বলছেন—আনন্দ-
রূপমমৃতং যদ্বিভাতি—তিনি কর্মের মধ্যেই
আপন আনন্দবাণী বলছেন, আপন অমৃত
সঙ্গীত বলছেন। তাঁর সেই আনন্দ এবং
তাঁর কর্ম একেবারে একাকার হয়ে ছ্যালোকে
ভুলোকে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

ব্রহ্মবাদীও যখন ব্রহ্মকে বলবেন তখন
আর-কেমন করে বলবেন ? তাঁকে কর্মের
দ্বারাই বলতে হবে ? তাঁকে ক্রিয়াবান্
হতে হবে।

সে কর্ম কেমন কর্ম ? না, যে কর্মদ্বারা
প্রকাশ পায় তিনি “আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ”

শান্তিনিকেতন

পরমাখ্যার তাঁর ক্রীড়া, পরমাখ্যার তাঁর আনন্দ ।
যে কর্মে প্রকাশ পায় তাঁর আনন্দ নিজের
স্বার্থসাধনে নয়, নিজের গৌরব বিস্তারে নয় ।
তিনি যে “নাতিবাদী”—তিনি পরমাখ্যাকে
ছাড়া নিজের কর্মে আর কাউকেই প্রকাশ
করতে চান না ।

তাই সেই ব্রহ্মবিদ্যাং বরিষ্ঠঃ তাঁর জীবনের
প্রত্যেক কাজে নানা ভাষায় নানা রূপে এই
সঙ্গীত ধ্বনিত করে তুলেছেন—“শান্তম্ শিবম-
বৈতম্ ।” জগৎক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর জীবনক্রিয়া
এক ছন্দে এক রাগিণীতে গান করছে ।

অন্তরের মধ্যে যা আত্মক্রীড়া, যা
পরমাখ্যার সঙ্গে ক্রীড়া, বাহিরে সেইটাই যে
জীবনের কর্ম । অন্তরের সেই আনন্দ বাহিরের
সেই কর্মে উচ্ছৃঙ্খিত হচ্ছে, বাহিরের সেই কর্ম
অন্তরের সেই আনন্দে আবার ফিরে ফিরে
বাচ্ছে । এমনি করে অন্তরে বাহিরে আনন্দ
ও কর্মের অপূর্ণ স্বন্দর আবর্তন চলছে

প্রাণ

এবং সেই আবর্তনবেগে নব নব মঙ্গল
লোকের সৃষ্টি হচ্ছে। সেই আবর্তনবেগে
জ্যোতি উদ্দীপ্ত হচ্ছে, প্রেম উৎসারিত হয়ে
উঠছে।

এমনি করে, যিনি চরাচর নিখিলে প্রাণ-
রূপে অর্থাৎ একইকালে আনন্দ ও কর্মরূপে
প্রকাশমান সেই প্রাণকে ব্রহ্মবিৎ আপনার
প্রাণের দ্বারাই প্রকাশ করেন।

সেইজন্তে আমার প্রার্থনা এই যে, হে
প্রাণস্বরূপ, আমার সেতারের তারে যেন
মরচে না পড়ে, যেন ধূলো না জমে—বিশ্বপ্রাণের
স্পন্দনাভিঘাতে সে দিনরাত বাজতে থাকুক—
কর্ম সঙ্গীতে বাজতে থাকুক—তোমারি
নামে বাজতে থাকুক! প্রবল আঘাতে
মাঝে মাঝে যদি তার ছিঁড়ে যায় ত সেও
ভাল কিন্তু শিথিল না হয়, মলিন না হয়,
ব্যর্থ না হয়। ক্রমেই তার সুর প্রবল হোক,
গভীর হোক, সমস্ত অস্পষ্টতা পরিহার করে

শান্তিনিকেতন

সত্য হয়ে উঠুক—প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত
এবং মানবাত্মার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হোক—হে
আবি তোমার আবির্ভাবের দ্বারা সে ধন্য
হোক !

২৯শে পৌষ

—

জগতে মুক্তি

ভারতবর্ষে একদিন অদ্বৈতবাদ কর্মকে অজ্ঞানের, অবিদ্যার কোঠায় নির্বাসিত করে অত্যন্ত বিগৃহ্য হতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন ব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্মলাভ করতে গেলে কর্মকে সমূলে ছেদন করা আবশ্যিক।

সেই অদ্বৈতবাদের ধারা ক্রমে যখন দ্বৈতবাদের নানা শাখাময়ী নদীতে পরিণত হল তখন ব্রহ্ম এবং অবিদ্যাকে নিয়ে একটা দ্বিধা উৎপন্ন হল।

তখন দ্বৈতবাদী ভারত জগৎ এবং জগতের মূলে দুইটি তত্ত্ব স্বীকার করলেন। প্রকৃতি ও পুরুষ।

অর্থাৎ ব্রহ্মকে তারা নিষ্ক্রিয় নিগুণ বলে

শান্তিনিকেতন

একপাশে সরিয়ে রেখে দিলেন এবং শক্তিকে জগৎক্রিয়ার মূলে যেন স্বতন্ত্র সত্তারূপে স্বীকার করলেন। এইরূপে ব্রহ্ম যে কৰ্ম্ম দ্বারা বদ্ধ নন এ কথাও বললেন অথচ কৰ্ম্ম যে একেবারে কিছুই নয় তাও বলা হল না। শক্তি ও শক্তির কার্য থেকে শক্তিমানকে দূরে বসিয়ে তাঁকে একটা খুব বড় পদ দিয়ে তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করলেন।

শুধু তাই নয়, এই ব্রহ্মই যে পরাস্ত, তিনিই যে ছোট সে কথাও নানারূপকের দ্বারা প্রচার করতে লাগলেন।

এমনটি যে ঘটল তার মূলে একটি সত্য আছে।

মুক্তির মধ্যে একইকালে একটি নিঃশূণ দিক্ এবং একটি সগুণ দিক্ দেখা যায়। তারা একত্র বিরাজিত। আমরা সেটা আমাদের নিজের মধ্য থেকেই বুঝতে পারি। সেই কথাটার আলোচনা করবার চেষ্টা করা যাক্।

জগতে মুক্তি

একদিন জগতের মধ্যে একটি অথও নিয়মকে আমরা আবিষ্কার করিনি। তখন মনে হয়েছে জগতে কোনো এক বা অনেক শক্তির কৃপা আছে কিন্তু বিধান নেই। যখন তখন যা খুসি তাই হতে পারে। অর্থাৎ যা কিছু হচ্ছে তা এমনি একতরফা হচ্ছে যে আমার দিক থেকে তার দিকে যে যাব এমন রাস্তা বন্ধ—সমস্ত রাস্তাই হচ্ছে তার দিক থেকে আমার দিকে—আমার পক্ষে কেবল ভিক্ষার রাস্তাটি খোলা।

এমন অবস্থায় মানুষকে কেবলি সকলের হাত পায়ে ধরে বেড়াতে হয়। আগুনকে বলতে হয় তুমি দয়া করে জ্বল, বাতাসকে বলতে হয় তুমি দয়া করে বও, সূর্য্যাকে বলতে হয় তুমি যদি কৃপা করে না উদয় হও তবে আমার রাত্রি দূর হবে না।

ভয় কিছুতেই ঘোচেনা। “অব্যবস্থিত চিন্তা প্রসাদোহপি ভয়ঙ্করঃ”—যেখানে ব্যবস্থা

শান্তিনিকেতন

দেখতে পাইনে সেখানে প্রসাদেও মন নিশ্চিত
হয় না—কারণ, সেই প্রসাদের উপর আমার
নিজের কোনো দাবী নেই—সেটা একেবারেই
এক তরফা জিনিষ ।

অথচ যার সঙ্গে এতবড় কারবার তার সঙ্গে
মানুষ নিজের একটা যোগের পথ না খুলে যে
বাঁচতে পারে না । কিন্তু তার মধ্যে যদি কোনো
নিয়ম না থাকে তবে তার সঙ্গে যোগেরও ত
কোনো নিয়ম থাকতে পারে না ।

এমন অবস্থায় যে লোকই তাকে যে রকমই
তুকতাক বলে তাই সে আঁকড়ে থাকতে চায়,
সেই তুকতাক যে মিথ্যে তাও তাকে বোঝানো
অসম্ভব—কারণ, বোঝাতে গেলেও নিয়মের
দোহাই দিয়েই ত বোঝাতে হয় ! কাজেই মানুষ
মন্ত্রতন্ত্র তাগা তাবিজ এবং অর্থহীন বিচিত্র
বাহ্যপ্রক্রিয়া নিয়ে অস্থির হয়ে বেড়াতে থাকে ।

জগতে এ রকম করে থাকা ঠিক পরের
বাড়ী থাকা । সেও আবার এমন পর যে

জগতে মুক্তি

ধাম্বেয়ালিতার অবতার । হয় ত পাত পেড়ে
দিয়ে গেল কিন্তু অন্ন আর দিলই না, হয় ত
হঠাৎ হুকুম হল আজই এখনি ঘর ছেড়ে
বেরতে হবে ।

এই রকম জগতে, পরান্নভোজী পরাবসথ-
শায়ী হয়ে মানুষ পীড়িত এবং অবমানিত হয় ।
সে নিজেকে বদ্ধ বলেই জানে ও দীন বলে
শোক করতে থাকে ।

এর থেকে মুক্তি কখন পাই ? এর থেকে
পালিয়ে গিয়ে নই—কারণ, পালিয়ে যাব
কোথায় ? মরবার পথও যে এ আগলে বসে
আছে ।

জ্ঞান যখন বিশ্বজগতে অথও নিয়মকে
আবিষ্কার করে—যখন দেখে কার্যকারণের
কোথাও ছেদ নেই তখন সে মুক্তিলাভ করে ।

কেন না, জ্ঞান তখন জ্ঞানকেই দেখে ।
এমন কিছুকে পায় যার সঙ্গে তার যোগ আছে,
যা তার আপনারি । তার নিজের যে আলোক

শান্তিনিকেতন

সর্বত্রই সেই আলোক । এমন কি, সর্বত্রই
সেই আলোক অখণ্ডরূপে না থাকলে সে
নিজেই বা কোথায় থাকত !

এতদিনে জ্ঞান মুক্তি পেলো । সে আর
ত বাধা পেল না । সে বলল, আঃ বাঁচা গেল,
এ যে আমাদেরই বাড়ি—এ যে আমার
পিতৃভবন ! আর ত আমাকে সঙ্কচিত হয়ে
অপমানিত হয়ে থাকতে হবে না ! এতদিন স্বপ্ন
দেখছিলুম যেন কোন্ পাগুলাগারদে আছি—
আজ স্বপ্ন ভেঙেই দেখি—শিয়রের কাছে পিতা
বসে আছেন সমস্তই আমার আপনার ।

এই ত হল জ্ঞানের মুক্তি । বাইরের
কিছু থেকে নয়—নিজেরই করুণা থেকে ।

কিন্তু এই মুক্তির মধ্যেই জ্ঞান চূপচাপ
বসে থাকে না । তার মন্ত্রতন্ত্র তাগা তাবিজের
শিকল ছিন্ন ভিন্ন করে এই মুক্তির ক্ষেত্রে
তার শক্তিকে প্রয়োগ করে ।

যখন আমরা আত্মীয়ের পরিচয় পাই তখন

জগতে মুক্তি

সেই পরিচয়ের উপরেই ত চূপচাপ করে বসে থাকতে পারিনে, তখন আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তার আদান প্রদান করবার জন্য উদ্ভূত হয়ে উঠি।

জ্ঞান যখন জগতে জ্ঞানের পরিচয় পায় তখন তার সঙ্গে কাজে যোগ দিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন পূর্বের চেয়ে তার কাজ ঢের বেড়ে যায়—কারণ, মুক্তির ক্ষেত্রে শক্তির অধিকার বহু বিস্তৃত হয়ে পড়ে। তখন জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের যোগে জাগ্রত শক্তি বহুধা হয়ে প্রসারিত হতে থাকে।

তবেই দেখা যাচ্ছে জ্ঞান বিশ্বজ্ঞানের মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করে' আর চূপ করে' থাকতে পারে না। তখন শক্তির যোগে কর্মদ্বারা নিজেকে সার্থক করতে থাকে।

প্রথমে অজ্ঞান থেকে মুক্তির মধ্যে জ্ঞান নিজেকে লাভ করে—তার পরে নিজেকে দান করা তার কাজ। কর্মের দ্বারা সে নিজেকে

শান্তিনিকেতন

দান করে, সৃষ্টি করে, অর্থাৎ সর্জন করে, অর্থাৎ যে শক্তিকে পরের ঘরে বন্দীর মত থেকে কেবলি বদ্ধ করে রেখেছিল সেই শক্তিকেই আত্মীয় ঘরে নিয়তই ত্যাগ করে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে ।

অতএব দেখা যাচ্ছে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই কন্মের বৃদ্ধি বই হ্রাস নয় ।

কিন্তু কন্ম যে অধীনতা । সে কথা স্বীকার করতেই হবে । কন্মকে সত্যের অনুগত হতেই হবে, নিয়মের অনুগত হতেই হবে, নইলে সে কন্মই হতে পারবে না ।

তা কি করা যাবে ? নিন্দাই কর আর ঘাই কর, আমাদের ভিতরকার শক্তি সত্যের অধীন হতেই চাচ্ছেন । সেই তাঁর প্রার্থনা । সেই জন্মেই মহাদেবের প্রসাদপ্রার্থী পার্শ্বতীর মত তিনি তপস্শা করছেন ।

জ্ঞান যে দিন পুরোহিত হয়ে সত্যের সঙ্গে আমাদের শক্তির পরিণয় সাধন করিয়ে দেন

অগতে মুক্তি

তখনি আমাদের শক্তি সতী হন—তখন তাঁর
বক্যাদশা আর থাকে না। তিনি সত্যের
অধীন হওয়াতেই সত্যের ঘরে কর্তৃত্বলাভ
করতে পারেন।

অতএব, কেবল মুক্তির দ্বারা সাফল্য নয়
—তারও পরের কথা হচ্ছে অধীনতা। দানের
দ্বারা অর্জন যেমন তেমনি এই অধীনতার
দ্বারাই মুক্তি সম্পূর্ণ সার্থক হয়। এইজন্যই
দ্বৈতশাস্ত্রে নিশ্চরণ ব্রহ্মের উপরে সগুণ ভগ-
বানকে ঘোষণা করেন। আমাদের প্রেম,
জ্ঞান ও শক্তি এই তিনকেই পূর্ণভাবে ছাড়া
দিতে পারলেই তবেই ত তাকে মুক্তি বলব—
নিশ্চরণ ব্রহ্মে তার যে কোনো স্থান নেই।

১লা মাঘ



সমাজে মুক্তি

মানুষের কাছে কেবল জগৎপ্রকৃতি নয় সমাজপ্রকৃতি বলে আর একটি আশ্রয় আছে। এই সমাজের সঙ্গে মানুষের কোন্ সম্বন্ধটা সত্য সে কথা ভাবতে হয়। কারণ সেই সত্য সম্বন্ধেই মানুষ সমাজে মুক্তিলাভ করে— মিথ্যাকে সে যতখানি আসন দেয় তত খানিই বন্ধ হয়ে থাকে।

আমরা অনেক সময় বলেছি ও মনে করেছি প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে বন্ধ হয়েছে। আমরা একত্রে দল বাঁধানো বিস্তার সুবিধা আছে। রাজা আমার বিচার করে, পুলিশ আমার পাহারা দেয়, পৌরপরিষৎ আমার রাস্তা বাঁট দিয়ে যায়, ম্যাক্গেষ্ঠার আমার কাপড় জোগায় এবং জ্ঞানলাভ প্রভৃতি আরও বড় বড় উদ্দেশ্যও এই উপায়ে সহজ

সমাজে মূর্তি

হয়ে আসে। অতএব মানুষের সমাজ সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থ সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়।

এই প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে আবদ্ধ হয়েছে এই কথাকেই অন্তরের সঙ্গে যদি সত্য বলে জানি তাহলে সমাজকে মানব হৃদয়ের কারাগার বলতে হয়—সমাজকে একটা প্রকাণ্ড এঞ্জিনওয়ালার কারখানা বলে মানতে হয়—ক্ষুধানলদীপ্ত প্রয়োজনই সেই কলের কয়লা জোগাচ্ছে।

যে হতভাগ্য এই রকম অত্যন্ত প্রয়োজন-ওয়ালার হয়ে সংসারের খাটুনি খেটে মরে সে শু কুপাপাত্র সন্দেহ নেই।

সংসারের এই বন্দিশাল-মূর্তি দেখেই ত সন্তাসী বিদ্রোহ করে ওঠে—সে বলে প্রয়োজনের তাড়ায় আমি সমাজের হরিণবাড়িতে পাথর ভেঙে মরব? কোনোমতেই না। জানি আমি প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বড়। ম্যাঞ্চেস্টার আমার কাপড় জোগাবে? দরকার কি!

শান্তিনিকেতন

আমি কাপড় ফেলে দিয়ে বনে চলে যাব !
বাণিজ্যের জাহাজ দেশবিদেশ থেকে আমার
খাওয়া এনে দেবে ? দরকার নেই—আমি বনে
গিয়ে ফল মূল খেয়ে থাকুব !

কিন্তু বনে গেলেও যখন প্রয়োজন আমার
পিছনে পিছনে নানা আকারে তাড়া করে
তখন এতবড় স্পর্ধা আমাদের মুখে সম্পূর্ণ
শোভা পায় না ।

তবে সংসারের মধ্যে আমাদের মুক্তি
কোন্‌ খানে ? প্রেমে । যখনি জানুব প্রয়ো-
জনই মানব সমাজের মূলগত নয়—প্রেমই এর
নিগূঢ় এবং চরম আশ্রয়—তখনই এক মুহূর্তে
আমরা বন্ধনমুক্ত হয়ে যাব । তখনি বলে
উঠুব—প্রেম ! আঃ বাঁচা গেল ! তবে আর
কথা নেই । কেননা, প্রেম যে আমারি
জিনিষ । এ ত আমাকে বাহির থেকে তাড়া
লাগিয়ে বাধ্য করে না । প্রেমই যদি মানব
সমাজের তত্ত্ব হয় তবে সে ত আমারি তত্ত্ব ।

সমাজে মুক্তি

অতএব প্রেমের দ্বারা মুহূর্ত্তেই আমি প্রয়ো-
জনের সংসার থেকে মুক্ত আনন্দের সংসারে
উত্তীর্ণ হইলাম।—যেন পলকে স্বপ্ন ভেঙে গেল।

এই ত গেল মুক্তি। তার পরে ; তার
পরে অধীনতা। প্রেম মুক্তি পাবামাত্রই সেই
মুক্তিক্ষেত্রে আপনার শক্তিকে চরিতার্থ করবার
জন্তে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন তার কাজ
পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে ওঠে। তখন
সে পৃথিবীর দীন দরিদ্রেরও দাস, তখন সে
মুঢ় অধমেরও সেবক। এই হচ্ছে মুক্তির
পরিণাম।

যে মুক্ত তার ত ওজর নেই। সে ত বলতে
পারেনা, আমার আপিস আছে, আমার
মনিব আছে, বাইরে থেকে তাড়া আছে।
কাজেই যেখান থেকেই ডাক পড়ে তার আর
না বলবার জো নেই। মুক্তির এত বড় দায়।
আনন্দের দায়ের মত দায় আর কোথায়
আছে !

শান্তিনিকেতন

যদি বলি মানুষ মুক্তি চায় তবে মিথ্যা কথা
বলা হয়। মানুষ মুক্তির চেয়ে ঢের বেশি চায়
মানুষ অধীন হতেই চায়। যার অধীন হলে
অধীনতার অস্ত থাকে না তারই অধীন হবার
জন্তে সে কাঁদে। সে বলতে হে পরম প্রেম,
তুমি যে আমার অধীন, আমি কবে তোমার
অধীন হব! অধীনতার সঙ্গে অধীনতার পূর্ণ
মিলন হবে কবে! যেখানে আমি উদ্ধত,
গর্বিত, স্বতন্ত্র সেই ধানেই আমি পীড়িত,
আমি ব্যর্থ। হে নাথ আমাকে অধীন করে নত
করে বাঁচাও! যতদিন আমি এই মিথ্যোটাকে
অত্যন্ত করে জেনেছিলুম যে আমিই হচ্ছে আমি,
তার অধিক আমি আর নেই ততদিন আমি
কি ঘোরাই ঘুরেছি! আমার ধন আমার মনের
বোঝা নিয়ে মরেছি! যখন স্বপ্ন ভেঙে যায়
বুঝতে পারি তুমি পরম আমি আছো—আমার
আমি তারই জোরে আমি—তখন এক মুহূর্তে
মুক্তিলাভ করি। কিন্তু শুধু ত মুক্তিলাভ নয়।

সমাজে মুক্তি

তার পরে পরম অধীনতা ! পরম আমির
কাছে সমস্ত আমির অভিমান জলাঞ্জলি
দিয়ে একেবারে অনস্ত পরিপূর্ণ অধীনতার
পরমানন্দ ।

১লা মাঘ

মত

আত্মা যে শরীরকে আশ্রয় করে সেই শরীর তাকে ত্যাগ করতে হয়। কারণ, আত্মা শরীরের চেয়ে বড়। কোনো বিশেষ এক শরীর যদি আত্মাকে বরাবর ধারণ করে থাকতে পারত তাহলে আত্মা যে শরীরের মধ্যে থেকেও শরীরকে অতিক্রম করে তা আমরা জানতেই পারতুম না। এই কারণেই আমরা মৃত্যুর দ্বারা আত্মার মহত্ত্ব অবগত হই।

আত্মা এই হ্রাসবৃদ্ধিময়ণীল শরীরের মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করে। তার এই প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত প্রকাশ, সম্পূর্ণ প্রকাশ নয়; এই জ্ঞে শরীরকেই আত্মা বলে যে জানে সে সম্পূর্ণ সত্য জানে না।

মানুষের সত্যজ্ঞান এক একটি মতবাদকে

আশ্রয় করে নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই মতবাদটি সত্যের শরীর সুতরাং এক হিসাবে সত্যের চেয়ে অনেক ছোট এবং অসম্পূর্ণ।

এই জন্মে সত্যকে বারম্বার মতদেহ পরি-বর্তন করতে হয়। বৃহৎ সত্য তার অসম্পূর্ণ মতদেহের সমস্ত শক্তিকে শেষ করে ফেলে, তাকে জীর্ণ করে, বৃদ্ধ করে, অবশেষে যখন কোনো দিকেই আর কুলোয় না, নানা প্রকারেই সে অপ্রয়োজনীয় বাধাস্বরূপ হয়ে আসে তখন তার মৃত্যুর সময় আসে ; তখন তার নানা প্রকার বিকার ও ব্যাধি ঘটতে থাকে ও শেষে মৃত্যু হয়।

আত্মা, যে, কোনো একটা বিশেষ শরীর নয় এবং সমস্ত বিশেষ শরীরকেই সে অতি-ক্রম করে এই কথাটা যেমন উপলব্ধি করা আমাদের দরকার এবং এই উপলব্ধি জন্মালে যেমন আত্মার বিকার ও মৃত্যুর কল্পনার

শান্তিনিকেতন

আমরা ভীত ও পীড়িত হইনে—সেই রকম, মানুষ যে সকল মহৎ সত্যকে নানাদেশে নানা কালে নানা রূপে প্রকাশ করতে চেষ্টা করচে এক একবার তাকে তার মতদেহ থেকে স্বতন্ত্র করে সত্যআত্মাকে স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যিক। তাহলেই সত্যের অমৃত স্বরূপ জানতে পেরে আমরা আনন্দিত হই।

নইলে কেবলি মত এবং বাক্য নিয়ে বিবাদ করে আমরা অধীর হতে থাকি, এবং আমার মত স্থাপন করব ও অণ্ডের মত খণ্ডন করব এই অহঙ্কার স্মৃতির হয়ে উঠে' জগতে পীড়ার সৃষ্টি করে। এইরূপ বিবাদের সময় মতই প্রবল হয়ে উঠে' সত্যকে যতই দূরে ফেলতে থাকে বিরোধের বিষও ততই তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই কারণে, মতের অত্যাচার যেমন নির্ধুর ও মতের উন্মত্ততা যেমন উদ্দাম এমন আর কিছুই না। এই কারণেই সত্য আমা-

ধের ধৈর্য্যদান করে কিন্তু মত আমাদের ধৈর্য্য হরণ করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলতে পারি অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ নিয়ে যখন আমরা বিবাদ করি তখন আমরা মত নিয়েই বিবাদ করি, সত্য নিয়ে নয়—সুতরাং সত্যকে আচ্ছন্ন করে বিস্মৃত হয়ে আমরা একদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হই, আর একদিকে বিরোধ করে আমাদের দুঃখ ঘটে।

আমাদের মধ্যে যারা নিজেকে দ্বৈতবাদী বলে ঘোষণা করেন তাঁরা অদ্বৈতবাদকে বিস্তীর্ণিকা বলে কল্পনা করেন। সেখানে তাঁরা মতের সঙ্গে রাগারাগি করে সত্যকে পর্য্যন্ত এক-ঘরে' করতে চান।

যারা "অদ্বৈতম্" এই সত্যটিকে লাভ করেছেন তাঁদের সেই লাভটির মধ্যে প্রবেশ কর! তাঁদের কথায় যদি এমন কিছু থাকে যা তোমাকে আঘাত করে সেদিকে মন দেবার দরকার নেই।

শান্তিনিকেতন

মায়াবাদ ! শূন্যেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠ কেন ? মিথ্যা কি নেই ? নিজের মধ্যে তার কি কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নি ? সত্য কি আমাদের কাছে একেবারেই উন্মুক্ত ? আমরা কি এককে আর বলে জানিনে ? কাঠকে দগ্ধ করে যেমন আগুন জ্বলে আমাদের অজ্ঞানকে, অবিদ্যাকে, মায়াকে দগ্ধ করেই কি আমাদের সত্যের জ্ঞান জ্বলচে না ? আমাদের পক্ষে সেই মায়ার ইন্ধন জ্ঞানের জ্যোতিলাভের জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে কিন্তু এই মিথ্যা কি বন্ধে আছে ?

অনন্তের মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান যে একেবারে পর্যাবসিত হয়ে আছে, অথচ আমার কাছে খণ্ডভাবে তা পরিবর্তনপরম্পরারূপে চলেছে, কোথাও তার পর্যাপ্তি নেই । এক জাগ্রগায় ব্রহ্মের মধ্যে যদি কোনো পরিসমাপ্তি না থাকে তবে আমরা এই যে খণ্ড কালের ক্রিয়াকে অসমাপ্ত বলছি একে

অসমাপ্ত আখ্যা দেবারও কোনো তাৎপর্য থাকত না।

এই খণ্ডকালের অসমাপ্তি একদিকে অনন্তকে প্রকাশও করচে একদিকে আচ্ছন্নও করচে। যেদিকে আচ্ছন্ন করচে সেদিকে তাকে কি বলব? তাকে মায়ী বলব না কি, মিথ্যা বলব না কি? তবে “মিথ্যা” শব্দটার স্থান কোথায়?

যিনি খণ্ড কালের সমস্ত খণ্ডতা সমস্ত ক্রমিকতার আক্রমণ থেকে ক্ষণকালের জন্তুও বিমুক্ত হয়ে অনন্ত পরিসমাপ্তির নির্বিকার নিরঞ্জন অতলস্পর্শ মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে নিমজ্জিত করে দিয়ে সেই স্তব্ধ শাস্ত গস্তীর অদ্বৈতরসসমুদ্রে নিবিড়ানন্দের নিশ্চল স্থিতিলাভ করেছেন তাঁকে আমি ভক্তির সঙ্গে নমস্কার করি। আমি তাঁর সঙ্গে কোনো কথা নিয়ে বাদপ্রতিবাদ করতে চাইনে।

কেননা, আমি যে অনুভব করছি, মিথ্যার

শান্তিনিকেতন

বোঝায় আমার জীবন ক্লাস্ত। আমি যে দেখতে পাচ্ছি, যে পদার্থটাকে “আমি” বলে ঠিক করে বসে আছি, তারই থালা ঘটি বাটি তারই স্বাবর অস্বাবরের বোঝাকে সত্য পদার্থ বলে ভ্রম করে সমস্ত জীবন টেনে বেড়াচ্ছি—যতই দুঃখ পাই কোনোমতেই তাকেই ফেলতে পারিনে! অথচ অন্তরাঙ্গার ভিতরে একটা বাণী আছে, ও সমস্ত মিথ্যা, ও সমস্ত তোমাকে ত্যাগ করতেই হবে! মিথ্যার বস্তুকে সত্য বলে বহন করতে গেলে তুমি বাঁচবে না—তাহলে তোমার “মহতী বিনষ্টিঃ।”

নিজের অহঙ্কারকে, নিজের দেহকে, টাকাকড়িকে, খ্যাতি প্রতিপত্তিকে একান্ত সত্য বলে জেনে অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছি এই যদি হয় তবে এই মিথ্যার সীমা কোথায় টানব? বুদ্ধির মূলে যে ভ্রম থাকতে আমি নিজেকে ভুল জান্চি, সেই ভ্রমই কি সমস্ত জগৎসম্বন্ধেও আমাদের ভোলাচ্ছে না? সেই ভ্রমই কি

মত

আমার জগতের কেন্দ্রস্থলে আমার “আমি”টিকে স্থাপন করে মরীচিকা রচনা করচে না ? তাই, ইচ্ছা কি করে না, এই মাকড়ষার জাল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন পরিষ্কার করে দিয়ে সেই পরমাত্মার, সেই পরম-আমির, সেই একটিমাত্র আমির মাঝখানে অহঙ্কারের সমস্ত আবরণ-বিবর্জিত হয়ে অবগাহন করি— ভারমুক্ত হয়ে, বাসনামুক্ত হয়ে, মলিনতামুক্ত হয়ে একেবারে সুবৃহৎ পরিত্রাণ লাভ করি !

এই ইচ্ছা যে অন্তরে আছে, এই বৈরাগ্য যে সমস্ত উপকরণের ধাঁধার মাঝখানে পঞ্চভ্রষ্ট বালকের মত থেকে থেকে কেঁদে উঠে। তবে আমি মার্নাবাদকে গাল দেব কোন্ মুখে ! আমার মনের মধ্যে যে এক শ্মশানবাসী বসে আছে, সে যে আর কিছুই জানে না, সে যে কেবল জানে—“একমেবাদ্বিতীয়ং !”

২রা মাঘ

—

নির্বিশেষ

সংসার পদার্থটা আলো আধার ভালোমন্দ
জন্মমৃত্যু প্রভৃতি স্বন্দের নিকেতন এ কথা
অত্যন্ত পুরাতন। এই স্বন্দের দ্বারাই সমস্ত
খণ্ডিত। আকর্ষণ শক্তি বিপ্রকর্ষণ শক্তি,
কেন্দ্রানুগশক্তি কেন্দ্রাতিগশক্তি কেবলি
বিরুদ্ধতা দ্বারাই সৃষ্টিকে আশ্রিত করে রেখেছে।

কিন্তু এই বিরুদ্ধতাই যদি একান্ত সত্য
হত তাহলে অগতের মধ্যে আমরা যুদ্ধকেই
দেখতুম—শান্তিকে কোথাও : কিছুমাত্র
দেখতুম না।

অথচ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সমস্ত স্বন্দযুদ্ধের
উপরে অখণ্ড শান্তি বিরাজমান। তার কারণ
এই বিরোধ সংসারেই আছে বন্ধে নেই।

আমরা তর্কের জোরে সোয়া লাইনকে

নির্বিশেষ

অনন্তকাল সোজা করে টেনে নিয়ে চলতে পারি। আমরা মনে করি অক্ষকারকে সোজা করে টেনে চললে সে অনন্তকাল অক্ষকারই থাকবে—কারণ, অক্ষকারের একটা বিশিষ্টতা আছে—সেই বিশিষ্টতার কুত্রাপি অবসান নেই।

তর্কে এইপ্রকার সোজা লাইন থাকতে পারে কিন্তু সত্যে নেই। সত্যে গোল লাইন। অক্ষকারকে টেনে চলতে গেলে ধীরে ধীরে বেকে বেকে একজায়গায় সে আলোয় গোল হয়ে ওঠে। সুখকে সোজা লাইনে টানতে গেলে সে ছুঁখে এসে বেকে দাঁড়ায়—ভ্রমকে ঠেলে চলতে চলতে এক জায়গায় সে সংশোধনের রেখায় আপনি এসে পড়ে।

এর একটিমাত্র কারণ অনন্তের মধ্যে বিরুদ্ধতার পক্ষপাত নেই। অথগু আকাশ-গোলকের মধ্যে পূর্বদিকের পূর্বত্ব নেই, পশ্চিমের পশ্চিমত্ব নেই—পূর্ব পশ্চিমের

শান্তিনিকেতন

মাঝখানে কোনো বিরোধ নেই, এমন কি, বিচ্ছেদও নেই। পূর্বপশ্চিমের বিশেষত্ব খণ্ড-আমির বিশেষত্বকে আশ্রয় করেই আছে।

এই যে জিনিষটা ব্রহ্মের স্বরূপে নেই অথচ আছে তাকে কি নাম দেওয়া যেতে পারে? বেদান্ত তাকে মায়া নাম দিয়েছেন— অর্থাৎ ব্রহ্ম যে সত্য, এ সে সত্য নয়। এ মায়া। যখনি ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে যাই তখনি এ'কে আর দেখা যায় না। ব্রহ্মের দিক থেকে দেখতে গেলেই এ সমস্তই অখণ্ড গোলকে অনন্তভাবে পরিসমাপ্ত। আমার দিক দিয়ে দেখতে গেলেই বিরোধের মধ্যে প্রভেদের মধ্যে বহুর মধ্যে বিচিত্র বিশেষে বিভক্ত।

এইজন্য যারা সেই অখণ্ড অধৈতের সাধনা করেন তাঁরা ব্রহ্মকে বিশেষ হতে যুক্ত করে বিশুদ্ধভাবে জানেন। ব্রহ্মকে নির্বিশেষ জানেন। এবং এই নির্বিশেষকে উপলব্ধি করাকেই তাঁরা জ্ঞানের চরম লক্ষ্য করেন।

নির্বিশেষ

এই যে অষ্টমের বিরাট সাধনা, ছোট বড় নানা মাত্রার মানুষ এতে প্রবৃত্ত আছে। একেই মানুষ মুক্তি বলে। আপেল ফল পড়াকে মানুষ এক সময়ে একটা স্বতন্ত্র বিশেষ ঘটনা বলেই জানত। তারপরে তাকে একটা বিশ্বব্যাপী অতিবিশেষের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে জ্ঞানের বন্ধনযোচন করে দিলে। এইটি করাতেই মানুষ জ্ঞানের সার্থকতা লাভ করলে।

মানুষ অহঙ্কারকে যখন একান্ত বিশেষ করে জানে তখন সে নিজের সেই আমিকে নিয়ে সকল দুষ্কর্ম করতেই পারে। মানুষের ধর্ম-বোধ তাকে নিয়তই শিক্ষা দিচ্ছে তোমার আমিই একান্ত নয়। তোমার আমিকে সমাজ-আমির মধ্যে মুক্তি দাও। অর্থাৎ তোমার বিশেষত্বকে অতিবিশেষের অভিমুখে নিয়ে চল।

এই অতিবিশেষের অভিমুখে যদি বিশেষত্বকে না নিয়ে বাই তাহলে সংসার নিদারুণ বিশিষ্ট

শান্তিনিকেতন

মূর্তি ধারণ করে আমাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসে—তার সমস্ত পদার্থই একান্ত বোঝা হয়ে ওঠে। টাকা তখন অত্যন্ত একান্ত হয়ে উঠে অটাকাকে এমনি বিরুদ্ধ করে তোলে যে টাকার বোঝা কিছুতেই আর আমরা নামাতে পারিনে।

এই বন্ধন এই বোঝা থেকে মুক্তি দেবার জগ্রে মানুষের মধ্যে বড় বড় ভাব, মঙ্গল ভাব, ধর্মভাব কত রকম করে কাজ করচে। বড়র মধ্যে ছোটর বিশেষত্ব গুলি নিজের ঐকান্তিকতা ত্যাগ করে, এই জগ্রে বড়র মধ্যে বিশেষের দৌরাখ্য কম পড়াতে মানুষ বড় ভাবের আনন্দে ছোটর বন্ধন, টাকার বন্ধন, খ্যাতির বন্ধন ত্যাগ করতে পারে।

তাই দেখা যাচ্ছে নির্বিশেষের অভিমুখেই মানুষের সমস্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সমস্ত উন্নতির চেষ্টা কাজ করচে।

অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, বৈরাগ্যবাদ মানুষের

নির্ঝিংশেষ

এই ভাবে এই সত্যকে সমুজ্জ্বল করে দেখেছে।
সুতরাং মানুষকে অদ্বৈতবাদ একটা বৃহৎ
সম্পদদান করেছে—তার মধ্যে নানা অব্যক্ত
অর্ধব্যক্তভাবে যে সত্য কাজ করছিল; সমস্ত
আবরণ সরিয়ে দিয়ে তারই সম্পূর্ণ পরিচয়
দিয়েছে।

কিন্তু যেখানেই হোক বিশিষ্টতা বলে একটা
পদার্থ এসেছে। তাকে মিথ্যাই বলি মায়াই
বলি, তার মস্ত একটা জোর, সে আছে। এই
জোর সে পায় কোথা থেকে ?

ব্রহ্ম ছাড়া আর কোনো শক্তি (তাকে
সমতাম বল বা আর কোনো নাম দাও) কি
বাইরে থেকে জোর করে এই মায়াকে আরোপ
করে দিয়েছে ? সে ত কোনমতে মনেও করতে
পারিনে।

উপনিষদে এই প্রশ্নের উত্তর এই যে,
আনন্দাচ্ছ্যেব ধ্বিম্যানি ভূতানি জায়ন্তে ; ব্রহ্মের
আনন্দ থেকেই এই সমস্ত বা কিছু

শান্তিনিকেতন

হচ্ছে। এ তাঁর ইচ্ছা—তাঁর আনন্দ। বাইরের
জোর নয়।

এমনি করে বিশেষের পথ পার হয়ে সেই
নির্বিশেষে আনন্দের মধ্যে যেমনি পৌঁছন
যায় অমনি লাইন ঘুরে আবার বিশেষের দিকে
ফিরে আসে। কিন্তু তখন এই সমস্ত বিশেষকে
আনন্দের ভিতর দিয়ে দেখতে পাই—আর
সে আমাদের বন্ধ করতে পারে না। কর্ম
তখন আনন্দের কর্ম হয়ে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ
করে বেঁচে যায়—সংসার তখন আনন্দময় হয়ে
ওঠে। কর্মই তখন চরম হয় না, সংসারই তখন
চরম হয় না, আনন্দই তখন চরম হয়।

এমনি করে মুক্তি আমাদের যোগে নিয়ে
আসে, বৈরাগ্য আমাদের প্রেমে উত্তীর্ণ করে
দেয়।

৩রা মার্চ

দুই

“স পর্যগাক্রমকারমত্রণমন্নাবিরং শুদ্ধ

মপাপবিদ্ধং

কবিশ্বনৌষী পরিত্তুঃ স্বয়ম্ভু ষাথাভথাতোহর্ধান্

বাদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ।”

উপনিষদের এই মন্ত্রটিকে আমি অনেকদিন অবজ্ঞা করে এসেছি। নানা কারণেই এই মন্ত্রটিকে খাপছাড়া এবং অদ্ভুত মনে হত।

বাল্যকাল থেকে আমরা এই মন্ত্রের অর্থ এইভাবে শুনে আসছি:—

“তিনি সর্বব্যাপী, নিশ্চল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ; তিনি সর্বকালে প্রজাতিগকে যথোপযুক্ত অর্থ-সকল বিধান করিতেছেন।”

শান্তিনিকেতন

ঈশ্বরের নাম এবং স্বরূপের তালিকা নানা স্থানে শুনে শুনে আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন এগুলি আবৃত্তি করা এত সহজ হয়ে পড়েছে যে একত্র আর চিন্তা করতে হয় না—সুতরাং যে শোনে তারও চিন্তাউদ্বেক করে না।

বাল্যকালে উল্লিখিত মন্ত্রটিকে আমি চিন্তার দ্বারা গ্রহণ করিনি, বরঞ্চ আমার চিন্তার মধ্যে একটি বিদ্রোহ ছিল। প্রথমত এর ব্যাকরণ এবং রচনা প্রণালীতে ভারি একটা শৈথিল্য দেখতে পেতুম। “তিনি সর্বব্যাপী” এই কথাটাকে একটা ক্রিয়াপদের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে, যথা—“স পর্য্যগাৎ” ; তার পরে তাঁর অন্য সংজ্ঞা গুলি “শুক্রেং” “অকায়ং” প্রভৃতি বিশেষণ পদের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, শুক্রম্ অকায়ম্ এগুলি ক্লীবলিঙ্গ, তার পরেই হঠাৎ “কবিশ্বনীষী” প্রভৃতি পুংলিঙ্গ বিশেষণের প্রয়োগ হয়েছে। তৃতীয়ত ব্রহ্মের

শরীর নেই এই পর্য্যন্তই সহ্য করা যায় কিন্তু
 ব্রণ নেই স্নায়ু নেই বললে এক ত বাহ্যিক বলা
 হয় তার পরে আবার কথাটাকে অত্যন্ত নামিয়ে
 নিয়ে আসা হয়। এই সকল কারণে আমাদের
 উপাসনার এই মন্ত্রটি দীর্ঘকাল আমাকে পীড়িত-
 করেছে।

অন্তঃকরণ যখন ভাবকে গ্রহণ করবার
 জন্যে প্রস্তুত থাকে না তখন শ্রদ্ধাহীন শ্রোতার
 কাছে কথাগুলি তার সমস্ত অর্থটা উদ্বাটিত
 করে দেয় না। অধ্যাত্মমন্ত্রকে যখন সাহিত্য-
 সমালোচকের কান দিয়ে শুনেছি তখন সাহি-
 ত্যের দিক দিয়েও তার ঠিক বিচার করতে
 পারিনি।

আমি সে জগ্বে অনুতপ্ত নই বরঞ্চ আনন্দিত।
 মূল্যবান জিনিষকে তখন লাভ করা সৌভাগ্য
 যখন তার মূল্য বোঝবার শক্তি কিছু পরিমাণে
 হয়েছে—যথার্থ অভাবের পূর্বে পেলে পাওয়ার
 আনন্দ ও সফলতা থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

পাণ্ডিত্যকেন্দ্র

পূর্বে আমি দেখতে পাইনি যে এই মন্ত্রের ছটি ছত্রে ছটি ক্রিয়াপদ প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। একটি হচ্ছে “পর্যাগাৎ” তিনি সর্বত্রই গিয়েছেন সর্বত্রই আছেন—আর একটি হচ্ছে “বাদধাৎ” তিনি সমস্তই করেছেন। এই মন্ত্রের এক অর্কে তিনি আছেন, অম্ব অর্কে তিনি করছেন।

যেখানে আছেন সেখানে ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ পদ, যেখানে করছেন সেখানে পুংলিঙ্গ বিশেষণ, অতএব বাহুল্য কোনো কথা না বলে একটি ব্যাকরণের ইচ্ছিতের দ্বারা এই মন্ত্র একটি গভীর সার্থকতা লাভ করেছে।

তিনি সর্বত্র আছেন কেননা তিনি মুক্ত তাঁর কোথাও কোনো বাধা নেই। না আছে শরীরের বাধা, না আছে পাপের বাধা। তিনি আছেন এই ধ্যানটিকে সম্পূর্ণ করতে গেলে তাঁর সেই মুক্ত বিগুহ স্বরূপকে মনে উদ্ভল করে দেখতে হয়। তিনি যে

কিছুতেই বন্ধ নন এইটাই সৰ্বব্যাপিৎসের
লক্ষণ ।

শরীর যার আছে সে সৰ্বত্র নেই । শুধু
সৰ্বত্র নেই তা নয় সে সৰ্বত্র নিৰ্বিকারভাবে
থাকতে পারে না কারণ শরীরের ধৰ্ম্মই বিকার ।
তাঁর শরীর নেই সুতরাং তিনি নিৰ্বিকার,
তিনি অত্রণ । যার শরীর আছে সে ব্যক্তি
স্বাধু প্রভৃতির সাহায্যে নিজের প্রয়োজন সাধন
করে—সে রকম সাহায্য তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ
অनावশ্যক । শরীর নেই বলার দ্রুণ কি বলা
হল তা ঐ অত্রণ ও অস্বাভিৰ বিশেষণের দ্বারা
ব্যক্ত করা হয়েছে—তাঁর শারীরিক সীমা নেই
সুতরাং তাঁর বিকার নেই এবং ধণ্ডভাবে
ধণ্ড উপকরণের দ্বারা তাঁকে কাজ করতে
হয় না । তিনি শুদ্ধঃ অপাপবিদ্ধঃ—কোনো
প্রকার পাপ প্রবৃত্তি তাঁকে একদিকে হেলিয়ে
একদিকে বেঁধে রাখে না । সুতরাং তিনি
সৰ্বত্রই সম্পূর্ণ সমান । এই ত গেল সপৰ্য্যগাৎ ।

শান্তিনিকেতন

তার পরে স ব্যদধাৎ ; যেমন অনন্ত দেশে
তিনি পর্যগাৎ তেমনি অনন্তকালে তিনি
ব্যদধাৎ । ব্যদধাৎ শাস্ত্রতীভ্য সমাভ্যঃ । নিত্য
কাল হতে বিধান করচেন এবং নিত্য কালের
জন্ত বিধান করচেন । সে বিধান কিছু-
মাত্র এলোমেলো নয়—যাথাতথ্যাতোহর্থান্
ব্যদধাৎ—যেধানকার যেটি অর্থ ঠিক সেইটেই
একেবারে যথাতথ্যরূপে বিধান করচেন । তার
আর বেশমাত্র ব্যত্যয় হবার ছো নেই ।

এই যিনি বিধান করেন তাঁর স্বরূপ কি ?
তিনি কবি । এস্থলে কবি শব্দের প্রতিশব্দস্বরূপ
সর্বদর্শী কথাটা ঠিক চলেনা । কেননা এখানে
তিনি যে কেবল দেখছেন তা নয় তিনি
করচেন । কবি শুধু দেখেন জানেন তা নয়
তিনি প্রকাশ করেন । তিনি যে কবি, অথাৎ
তাঁর আনন্দ যে একটি সূশৃঙ্খল সুষমার মধ্যে
সুবিহিত ছন্দে নিজেকে প্রকাশ করচে, তা
তাঁর এই জগৎ মহাকাব্য দেখলেই টের

হই

পাওয়া যায়। জগৎ প্রকৃতিতে তিনি কবি,
মানুষের মনঃপ্রকৃতিতে তিনি অধীশ্বর। বিশ্ব-
মানবের মন যে আপনাপনি যেমন তেমন
করে একটা কাণ্ড করচে তা নয় তিনি তাকে
নিগূঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ক্ষুদ্র থেকে ভূমার
দিকে, স্বার্থ থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে
চলেছেন। তিনিই হচ্ছেন পরিভূ :-—কি জগৎ-
প্রকৃতি কি মানুষের মন সর্বত্র তাঁর প্রভুত্ব।
কিন্তু তাঁর এই কবিত্ব ও প্রভুত্ব বাইরের কিছু
থেকে নিয়মিত হচ্ছে না তিনি স্বয়ম্ভু—তিনি
নিজেকেই নিজে প্রকাশ করেন। এই জন্তে
তাঁর কৰ্মকে তাঁর বিধানকে বাইরে থেকে
দেশে বা কালে বাধা দেবার কিছুই নেই—
এবং এই কারণেই শাস্তকালে তাঁর বিধান,
এবং ঘটাতথরূপে তাঁর বিধান।

আমাদের স্বভাবেও এই রকম ভাববাচ্য ও
কৰ্মবাচ্য ছইবাচ্য আছে। আমরাও হই এবং
করি। আমাদের হওয়া যতই বাধামুক্ত ও

১১

শান্তিনিকেতন

সম্পূর্ণ হবে আমাদের করাও ততই সুন্দর ও
যথার্থ হয়ে উঠবে। আমাদের হওয়ার
পূর্ণতা কিসে ? না পাপশূন্য বিশুদ্ধতার।
বৈরাগ্যদ্বারা আসক্তিবন্ধন থেকে মুক্ত হও—
পবিত্র হও, নির্বিকার হও। সেই ব্রহ্মচর্য
সাধনার তোমার হওয়া যেমন সম্পূর্ণ হতে
থাকবে, যতই তুমি তোমার বাধামুক্ত নিষ্পাপ
চিত্তের দ্বারা সর্বত্র ব্যাপ্ত হতে থাকবে, যতই
সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ
করবে—ততই তুমি সংসারকে কাব্য করে
তুলবে—মনকে রাজ্য করে তুলবে—বাহিরে
এবং অন্তরে প্রভু লাভ করবে ; অর্থাৎ
আত্মার স্বয়ম্ভূত সম্পূর্ণ হবে—অনুভব করবে
তোমার মধ্যে একটি মুক্তির অধিষ্ঠান আছে।

একই অনন্তচক্রে ভাব এবং কর্ম কেমন
মিলিত হয়েছে—হওয়া থেকে করা স্বতই
নিজের স্বয়ম্ভূ আনন্দে কেমন করে সৌন্দর্য্যে ও
ঐশ্বর্য্যে বহুধা হয়ে উঠেছে—বিশুদ্ধ নির্বিশেষ

বিচিত্র বিশেষের মধ্যে কেমন ধরা দিয়েছেন—
 যিনি অকায় তিনি কায়ের কাব্যরচনা করতেন,
 যিনি অপাপবিদ্ধ তিনি পাপপুণ্যময় মনের
 অধিপতি হয়েছেন—কোনোখানে এর আর
 ছেদ পাওয়া যায় না—উপনিষদের ঐ একটি
 ছোট মন্ত্রে সে কথা সমস্তটা বলা হয়েছে ।

৪ঠা মাঘ, কলিকাতা ।



বিশ্বব্যাপী ।

যো দেবোহগ্নৌ, যোহপসু, যো বিশ্বং

ভুবনমাবিবেশ—

য ওষধিসু, যো বনস্পতিসু, তস্মৈ দেবায়

নমোনমঃ ।—

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্ব-
ভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, যিনি ওষধিতে,
যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে বারবার
নমস্কার করি ।

ঈশ্বর সর্বত্র আছেন এ কথাটা আমাদের
কাছে অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে গেছে । এইজন্য
এই মন্ত্র আমাদের কাছে অনাবশ্যক ঠেকে ।
অর্থাৎ এই মন্ত্রে আমাদের মনের মধ্যে কোনো
চিন্তা আশ্রয় হয় না ।

বিখ্যাপী

অথচ একথাও সত্য যে ঈশ্বরের সর্ব-
ব্যাপিত্ব সম্বন্ধে আমরা যতই নিশ্চিত হয়ে
থাকি না কেন, “তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ”
এ আমাদের অভিজ্ঞতার কথা নয়—আমরা
সেই দেবতাকে নমস্কার করতে পারিনে।
ঈশ্বর সর্বব্যাপী এ আমাদের শোনা কথা মাত্র।
শোনা কথা পুরাতন হয়ে যায় মৃত হয়ে যায়—
একথাও আমাদের পক্ষে মৃত।

কিন্তু একথা যাঁরা কানে শুনে বলেন নি—
যাঁরা মস্তদ্রষ্টা—মস্তটিকে যাঁরা দেখেছেন তবে
বলতে পেরেছেন—তাঁদের সেই প্রত্যক্ষ
উপলব্ধির বাণীকে অগ্রমনস্ক হয়ে শুনলে
চলেনা—এ বাক্য যে কতখানি সত্য তা আমরা
যেন সম্পূর্ণ সচেতনভাবে গ্রহণ করি।

যে জিনিষকে আমরা সর্বদাই ব্যবহার
করি, যাতে আমাদের প্রয়োজন সাধন হয়,
আমাদের কাছে তার তাৎপর্য অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ
হয়ে যায়। স্বার্থ জিনিষটা যে কেবল নিজে

শান্তিনিকেতন

ক্ষুদ্র তা নয় যার প্রতি সে হস্তক্ষেপ করে
তাকেও ক্ষুদ্র করে তোলে। এমন কি, যে
মানুষকে আমরা বিশেষভাবে প্রয়োজনে লাগাই
সে আমাদের কাছে তার মানবত্ব পরিহার
করে বিশেষ যন্ত্রের সামিল হয়ে ওঠে। কেবাণী
তার আপিসের মনিবের কাছে প্রধানত যন্ত্র,
রাজার কাছে সৈন্তেরা যন্ত্র, যে চাষা আমাদের
অন্নের সংস্থান করে দেয় সে সজীব লাঙল
বলেই হয়। কোনো দেশের অধিপতি যদি
একথা অত্যন্ত করে জানেন যে সেই দেশ
থেকে তাঁদের নানা প্রকার সুবিধা ঘটে
তবে সেই দেশকে তাঁরা সুবিধার কঠিন জড়
আবরণে বেষ্টিত করে দেখেন—প্রয়োজন
সম্বন্ধের অতীত যে চিন্তা তাকে তাঁরা
দেখতে পারেন না।

জগৎকে আমরা অত্যন্ত ব্যবহারের সামগ্রী
করে তুলেছি। এইজন্য তার জলস্থল বাতাসকে
আমরা অবজ্ঞা করি—তাঁদের আমরা অহঙ্কৃত

বিশ্বব্যাপী

হয়ে ভৃত্য বলি এবং জগৎ আমাদের কাছে একটা যন্ত্র হয়ে ওঠে।

এই অবজ্ঞার দ্বারা আমরা নিজেকেই বঞ্চিত করি। যাকে আমরা বড় করে পেতুম তাকে ছোট করে পাই, যাতে আমাদের চিন্তাও পরিতৃপ্ত হত তাতে আমাদের কেবল পেট ভরে মাত্র।

যাঁরা জলস্থলবাতাসকে কেবল প্রতিদিনের ব্যবহারের দ্বারা জীর্ণ সঙ্কীর্ণ করে দেখেননি, যাঁরা নিত্য নবীন দৃষ্টি ও উজ্জ্বল জাগ্রত চৈতন্যের দ্বারা বিশ্বকে অস্তরের মধ্যে সমাদৃত অতিথির মত গ্রহণ করেছেন এবং চরাচর সংসারের মাঝখানে জোড়হস্তে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছেন—যো দেবোহর্গৌ যোহপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, য ওষধিষু যো বন-স্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ—তাঁদের উচ্চারিত এই সজীব মন্ত্রটিকে জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে দেখুন যে সর্বব্যাপী এই জ্ঞানকে

শান্তিনিকেতন

সর্বত্র সার্থক কর—বিনি সর্বত্র প্রত্যক্ষ,
তার প্রতি তোমার ভক্তি সর্বত্র উচ্ছ্বসিত
হয়ে উঠুক ।

বোধশক্তিকে আর অলস রেখোনা, দৃষ্টির
পশ্চাতে সমস্ত চিত্তকে প্রেরণ কর—দক্ষিণে
বামে, অধোতে উর্ধ্বে, সম্মুখে পশ্চাতে চেতনার
দ্বারা চেতনার স্পর্শলাভ কর—তোমার মধ্যে
অহোরাত্র যে ধীশক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে সেই
ধীশক্তির ষোগে ভূভুবঃস্বলোকে সর্বব্যাপী
ধীকে ধ্যান কর—নিজের তুচ্ছতাদ্বারা অগ্নি
জলকে তুচ্ছ কোরোনা । সমস্তই আশ্চর্য্য, সমস্তই
পরিপূর্ণ;—নমোনমঃ, নমোনমঃ—সর্বত্রই মাধা
নত হোক হৃদয় নব্র হোক, এবং আত্মীয়তা
প্রসারিত হয়ে যাক্ ; যাকে বিনামূল্যে পেয়েছি
তাকে সচেতন সাধনার মূল্যে লাভ কর, যে
অজস্র অক্ষয় সম্পদ বাহিরে রয়েছে তাকে
অস্তুরে গ্রহণ করে ধন্য হও !

“ষ ওষধিষু ষো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায়

বিশ্বব্যাপী

নমোনমঃ”—পূর্ষছত্রে আছে যিনি অধিতে,
জলে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন—
তার পরে আছে যিনি ওষধিতে বনস্পতিতে
তাঁকে বারবার নমস্কার করি ।

হঠাৎ মনে হতে পারে প্রথম ছত্রেই
কথাটা নিঃশেষিত হয়ে গেছে—তিনি বিশ্ব-
ভুবনেই আছেন—তবে কেন শেষের দিকে
কথাটাকে এত ছোট করে ওষধি বনস্পতির
নাম করা হল ?

বস্তুত মানুষের কাছে এইটেই শেষের
কথা । ঈশ্বর বিশ্বভুবনে আছেন একথা বলা
শক্ত নয় এবং আমরা অনাগ্রাসেই বলে থাকি—
একথা বলতে গেলে আমাদের উপলব্ধিকে
অত্যন্ত সত্য করে তোলার প্রয়োজন হয় না ।
কিন্তু তার পরেও যে ঋষি বলেছেন, তিনি
এই ওষধিতে এই বনস্পতিতে আছেন—সে
ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা—মন্ত্রকে তিনি কেবল মননের দ্বারা
পাননি, দর্শনের দ্বারা পেয়েছেন । তিনি তাঁর

শান্তিনিকেতন

তপোবনের তরুণতার মধ্যে কেমন পরিপূর্ণ
চেতনভাবে ছিলেন, তিনি যে নদীর জলে
স্নান কর্তেন সে স্নান কি পবিত্র স্নান, কি সত্য
স্নান, তিনি যে ফল ভক্ষণ করেছিলেন তার
স্বাদের মধ্যে কি অমৃতের স্বাদ ছিল—তার
চক্ষে প্রভাতের সূর্যোদয় কি গভীর গভীর
কি অপরূপ প্রাণময় চৈতন্যময় সূর্যোদয়—সে
কথা মনে করলে হৃদয় পুলকিত হয়।

তিনি বিশ্বভূবনে আছেন একথা বলে
তাঁকে সহজে বিদায় করে দিলে চলবেনা—কবে
বলতে পারব তিনি এই ঔষধিতে আছেন এই
বনস্পতিতে আছেন।

এই মাঘ

মৃত্যুর প্রকাশ

আজ পিতৃদেবের মৃত্যুর বাৎসরিক ।

তিনি একদিন ৭ই পৌষে ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন । শান্তিনিকেতনের আশ্রমে সেই তাঁর দীক্ষাদিনের বাষিক উৎসব আমরা সমাধা করে এসেছি ।

সেই ৭ই পৌষে তিনি যে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ৬ই মাঘ মৃত্যুর দিনে সেই দীক্ষাকে সম্পূর্ণ করে তাঁর মহৎ জীবনের ব্রত উদ্ব্যাপন করে গেছেন ।

শিখা থেকে শিখা জ্বালাতে হয় । তাঁর সেই পরিপূর্ণ জীবন থেকে আমাদেরও অগ্নি গ্রহণ করতে হবে ।

এইজন্ত ৭ই পৌষে যদি তাঁর দীক্ষা হয় ৬ই মাঘ আমাদের দীক্ষার দিন । তাঁর জীবনের

শান্তিনিকেতন

সমাপ্তি আমাদের জীবনকে দীক্ষা দান করে ।
জীবনের দীক্ষা ।

জীবনের ব্রত অতি কঠিন ব্রত—এই
ব্রতের ক্ষেত্র অতি বৃহৎ—এর মন্ত্র অতি দুর্লভ,
এর কর্ম অতি বিচিত্র—এর ত্যাগ অতি
দুঃসাধ্য । যিনি দীর্ঘজীবনের নানা সুখে দুঃখে,
সম্পদে বিপদে, মানে অপমানে তাঁর একটি
মন্ত্র কোনোদিন বিস্মৃত হননি, তাঁর একটি
লক্ষ্য হতে কোনোদিন বিচলিত হননি, যার
জীবনে এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠেছিল—
মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্ মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোং,
অনিরাকরণমস্ত—আমাকে ব্রহ্ম ত্যাগ
করেননি, আমি যেন তাঁকে ত্যাগ না করি,
যেন তাঁকে পরিত্যাগ না হয়,—তাঁরই কাছ
থেকে আজ আমরা বিক্ষিপ্ত জীবনকে এক
পরমলক্ষ্যে সার্থকতা দান করবার মন্ত্র গ্রহণ
করব ।

পরিপক্ব ফল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়ে নিজেকে

মৃত্যুর প্রকাশ

সম্পূর্ণ দান করে—তেননি মৃত্যুর দ্বারাই তিনি তাঁর জীবনকে আমাদের দান করে গেছেন। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না পেলে এমন সম্পূর্ণ করে পাওয়া যায় না। জীবন নানা সীমার দ্বারা আপনাকে বেষ্টিত করে রক্ষা করে—সেই সীমা কিছু না কিছু বাধা রচনা করে।

মৃত্যুর দ্বারাই সেই মহাপুরুষ তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন—তার সমস্ত বাধা দূর হয়ে গেছে—এই জীবনকে নিয়ে আমাদের কোনো সাংসারিক প্রয়োজনের তুচ্ছতা নেই, কোনো লৌকিক ও সাময়িক সম্বন্ধের ক্ষুদ্রতা নেই—তার সঙ্গে কেবল একটি মাত্র সম্পূর্ণ যোগ হয়েছে, সে হচ্ছে অমৃতের যোগ। মৃত্যুই এই অমৃতকে প্রকাশ করে।

মৃত্যু আজ তাঁর জীবনকে আমাদের প্রত্যেকের নিকটে এনে দিয়েছে, প্রত্যেকের অন্তরে এনে দিয়েছে। এখন আমরা যদি প্রস্তুত থাকি, যদি তাঁকে গ্রহণ করি, তবে তাঁর জীবনের সঙ্গে

শান্তিনিকেতন

আমাদের জীবনের রাসায়নিক সম্মিলনের কোনো ব্যাঘাত থাকেনা। তাঁর পার্থিবজীবনের উৎসর্গ আজ কিনা ব্রহ্মের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে সেই জন্তে তিনি আজ সম্পূর্ণরূপে আমাদের সকলের হয়েছেন। বনের ফুল পূজা অবসানে প্রসাদীফুল হয়ে আজ বিশেষরূপেই সকলের সামগ্রী হয়েছেন। আজ সেই ফুলে তাঁর পূজার পুণ্য সম্পূর্ণ হয়েছে, আজ সেই ফুলে তাঁর দেবতার আশীর্বাদ মূর্তিমান হয়েছে। সেই পবিত্র নিম্নালাটি মাথায় করে নিয়ে আজ আমরা বাড়ি চলে যাব এই জন্তে তাঁর মৃত্যু দিনের উৎসব। বিশ্বপাবন মৃত্যু আজ স্বয়ং সেই মহৎজীবনকে আমাদের সম্মুখে উদঘাটন করে দাঁড়িয়েছেন—অতৃকার দিন আমাদের পক্ষে যেন ব্যর্থ না হয়।

একদিন কোন্‌ ৭ই পৌষে তিনি একলা অমৃত জীবনের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সে দিনকার সংবাদ খুব অল্পলোকেই জেনেছিল—

মৃত্যুর প্রকাশ

৬ই মাঘে মৃত্যু যখন ষবনিকা উদঘাটন করে
দাঁড়াল তখন কিছুই আর প্রচ্ছন্ন রইল না—
তাঁর একদিনের সেই একলার দীক্ষা আজ
আমরা সকলে মিলে গ্রহণ করবার অধিকারী
হয়েছি—সেই অধিকারকে আমরা সার্থক করে
যাব।

৬ই মাঘ কলিকাতা



